HUMAN RIGHTS WATCH

"বাঁচার কোনো অধিকার নেই"

বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক বন্দীদের "পায়ে গুলি" ও বিকলাঙ্গ করা

সারাংশ

২৮ শে ফ্রেব্রুয়ারী, ২০১৩ এর সকালবেলা, বিরোধীদল জামায়াত ই ইসলামী হরতালের আহ্বান জানায় তাদের নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মৃত্যুদণ্ডের প্রতিবাদে, যাকে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির কাছাকাছি একটি বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ফজল, ১৮ বছর বয়সের একজন আইনের ছাত্র যে কুতুব্ বাগ এলাকার কাছাকাছি একটি ছাত্রহলে থাকত, বলেছে সে প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করেনি, সকালের নাস্তা সারতে হল থেকে মাত্র বের হয়েছিল। তখন হঠাৎ তিনি সে গুলির শব্দ শোনে এবং মানুষকে দৌড়াতে দেখে। ফজল, যে কিনা পুলিশের নজর থেকে বাঁচার জন্য হিউম্যান রাইটস ওয়াচকে অনুরোধ করেছে একটি ছদ্মনাম ব্যবহারের জন্য, বলেছে যে সে দেখল, পুলিশ তিনজন মানুষকে মারধর করছিল এবং যখনই সে সরে যেতে চেয়েছিল তখনই একজন লোক পেছন থেকে তাঁর শার্টের কলার টেনে ধরে। ফজল বলেছে তাকেও মারধর করা হয় এবং পরে শেরে-এ-বাংলা পুলিশ স্টেশনে আনা হয়।

একজন টেলিভিশন কর্মী ফজলের গ্রেফতার ভিডিওতে ধারণ করেন, সেখানে দেখা গেছে যে পুলিশ হেফাজতে নেয়ার কালে সে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। ফজল বলেছে, পুলিশ স্টেশনে আরও কিছু বন্দী ছিল, যাদের সবাইকে গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে। একসময় সে তিনি শুনতে পায়, পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর তার ব্যাপারে কথা বলছেনঃ

> আমি অন্যদের সাথে মাটিতে বসে ছিলাম। পুলিশের এসআই তখন বলেছেন, "তাকে গুলি করা হয়নি। বাইরে নিয়ে এস"। তারা আমার কলার ধরে পুলিশ স্টেশনের পেছনে নিয়ে গেল।
>
> সেটা তাদের গোসলের জায়গা ছিল। প্রকৃতপক্ষে, সময়টা ছিল ভোরবেলা এবং কিছুদুরে পুলিশের লোকেরা দাঁত ব্রাশ করছিল অথবা দাঁড়ি কাটছিল। তারা আমার সামনেই রাইফেল এ গুলি ভরছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আমার কি দোষ?" আমাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য তাদের কাছে ভিক্ষা চাইলাম। তারা বলল, "চুপ থাকো।

> চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকো আমরা তোমাকে গুলি করব। তুমি যদি বেশী কথা বল, আমরা তোমার বুকে গুলি করব। তাদের একজন বলল, "আমাদের পাঁচ লাখ টাকা দাও [ইউএস ৮৬৩০০]। আমরা তোমাকে যেতে দেব।" আমি পাঁচ লাখ টাকার কথা শুনে চুপ করে গেলাম। আমি জানতাম আমার পরিবার পাঁচ লাখ টাকা দিতে পারবে না। তারা আমাকে তাদের রাইফেল দিয়ে মারতে শুরু করল। যে এসআই এর আমাকে গুলি করার কথা, সে বলল, "তার চোখ বেঁধে দাও।" তারা আমার চোখ বেঁধে দিল।
>
> আমি জানতাম তারা আমাকে গুলি করবে। আমি শব্দ শুনলাম। পরে আমি চোখ মেলে দেখলাম বারান্দায় শুয়ে আছি, রক্ত পড়ছে। আমি বুঝতে পারলাম যে আমাকে গুলি করা হয়েছে।

ফজলকে হাঁটুর ঠিক নিচে গুলি করা হয়েছিল এবং পরে তার পা কেটে ফেলে দিতে হয়েছে।

আনিস, ৪৫ বছর বয়সের একজন বই বিক্রেতা যিনি তার পরিচয় প্রকাশ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। একই বিক্ষোভ সমাবেশের কাছ থেকে পুলিশ তাকে তুলে নিয়ে যায়। তিনি বলেছেন তিনি তার এক পা হারিয়েছেন যখন পুলিশ একই দিনে শেরে বাংলা নগর পুলিশ স্টেশনে তাকে গুলিবিদ্ধ করে।

পুলিশ দাবি করেছে যে ফজল এবং আনিস সেই ১১ জনের মধ্যে পড়ে যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে যখন কয়েকশ বিক্ষোভকারী পুলিশ ও জনসাধারণের উপর হামলা চালায়। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, আত্মরক্ষা ও পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য তারা ৪৭ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে এবং পুলিশ হেফাজতে ইচ্ছাকৃতভাবে গুলি করার বিষয়টি তারা অস্বীকার করে। কিন্তু ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ট্রমাটোলজি এবং অর্থোপেডিক রিহ্যাবিটেশনের কাগজপত্রে দেখা যায় যে উভয় আহত ব্যাক্তিদের জরুরী বিভাগে আনা হয় বাম পায়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায়।

মাহবুব কবির, জামায়েতপন্থী পত্রিকা নয়া-দিগন্তের মার্কেটিং বিভাগের এক কর্মী বলেছেন যে ১৮ ই মার্চ, ২০১৩ সালে কাজ থেকে ফেরার পথে পুলিশ তার গতিরোধ করে। তিনি আরও বলেছেন যে তার পরিচয়পত্র পর্যবেক্ষণ করার পর, মিরপুর পুলিশ স্টেশনের একজন ঊর্ধ্বতন

কর্মকর্তা তার ডানপায়ে গুলি করে। এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন অন্যান্য সাংবাদিকেরা যারা বলেছেন যে মাহবুব কবির গ্রেফতারে কোন বাঁধা দেননি এবং পুলিশের উপর হামলাও করেননি। পরবর্তীতে পুলিশ তাকে একটি সরকারী অর্থোপেডিক হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং তার বিরুদ্ধে দাঙ্গা ও ভাংচুরের দায়ে দুটি মামলা করে, যদিও মাহবুব কবির বলেছেন যে হাঁপানির ইনহেলার ছাড়া তার কাছে পুলিশ আর কিছুই পায়নি। মাহবুব কবিরের মতে, যে পুলিশ অফিসার তাকে গুলিবিদ্ধ করেন, পরে তাকে হুমকি দেন যে, "আমি তোমার পায়ে গুলি করেছি, তুমি যদি আমার বিরুদ্ধে কিছু বল, তাহলে পরেরবার আমি তোমার চোখে গুলি করব"।

আকরাম (ছদ্মনাম), ৩২ বছর বয়সের একজন কৃষক, বলেছেন যে চট্টগ্রামে রেইডের পর একজন পুলিশ অফিসার ইচ্ছাকৃতভাবে তার পায়ে গুলি চালায়ঃ "আমাকে কিছু সময় মারধর করার পর, পুলিশ আমাকে গাছের সাথে বেঁধে রাখে। তারপর [একজন পুলিশ অফিসার] আমার বাম পায়ের হাঁটুর উপরে গুলি চালায়। সেই পুলিশ অফিসার সব অভিযোগ অস্বীকার করে বাংলাদেশের একটি মানবাধিকার সংস্থাকে বলেছেন যে, আকরামের মত ভয়ংকর অপরাধীর "বাঁচার কোন অধিকার নেই"। তবে এর কিছু মাস পরে, বেআইনিভাবে অস্ত্র বিনিময়ের সময় অন্য একজন সন্দেহভাজন আসামীকে গুলি করার কথা স্বীকার করে, তিনি বাংলাদেশে চলে আসা বিচার বহির্ভূত হত্যার সংস্কৃতির কথা মেনে নেন এই বলে যে, "সে [আসামী] এখনও বেঁচে আছে কারন পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। যদি র‍্যাব [র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন] বা অন্য কোনও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাকে ধরত, সে এতক্ষণে মৃত থাকত।"

এ রিপোর্টটি, ২০১৩ সাল থেকে বাংলাদেশ নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক বেশ কয়েকটি "পায়ে গুলি চালানোর" ঘটনা –যেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে বন্দীদের পায়ের নিচের অংশে গুলি করা হয়, এবং অন্যান্য বেআইনী গুলিবর্ষণের ঘটনাগুলোকে তুলে ধরেছে। বেশকিছু বিরোধীদলের সমর্থক যেমনঃ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), ছাত্র শিবির-জামায়েতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠন বলেছে যে, বাংলাদেশের পুলিশ তাদের আটক করার পর ইচ্ছাকৃতভাবে গুলি করে, পরে মিথ্যা দাবি করে যে আত্মরক্ষার জন্য অথবা সহিংস প্রতিবাদের সময় বন্দীদের গুলি করা হয়। অন্যান্য যাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা বলেছেন যে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশে অংশগ্রহন অথবা পাশ দিয়ে যাবার পথে তাদের গুলি করা হয়।

বেশিরভাগ মানুষ এই প্রতিবেদনের জন্য সাক্ষাৎকারে তাদের পরিচয় প্রকাশে অস্বীকৃতি জানায়, আইনগত শাস্তির আশংকা করে কারণ তাদের প্রায় সবাই ফৌজদারী মামলায়

অভিযুক্ত। আহতদের অন্যরা ভয় করে নির্বিচারে গ্রেফতার, নিখোঁজ, নির্যাতন অথবা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে, যেগুলো বাংলাদেশে বেশ সাধারণ ঘটনা, বিশেষত তারা যদি বিরোধীদলের সমর্থক হয়। অনেকেই জামিন প্রাপ্তির জন্যে, পুলিশ হেফাজতে আরও বেশী মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে অথবা চিকিৎসার ব্যবস্থার জন্য ঘুষ প্রদানের বিষয়টি স্বীকার করে।

যদিও প্রতিটা ঘটনার ক্ষেত্রে হিউম্যান রাইটস ওয়াচ নিশ্চিতভাবে বলার অবস্থানে নেই যে গুলির ঘটনাগুলো ঘটেছে আত্মরক্ষার জন্য বা সহিংস বিক্ষোভের সময় গোলাগুলি চলাকালে বলে পুলিশ যা দাবী করেছে সেটা মিথ্যা, কিন্তু যে আহত মানুষদের কথা এখানে বলা হল তারা যে দাবী করেছেন যে পুলিশ কোনও প্ররোচনা ছাড়াই তাদের গুলিবিদ্ধ করেছে সেটাও বেশ বিস্তারিত এবং বিশ্বাসযোগ্য। এই সকল ঘটনাগুলো সন্দেহের উদ্রেককারী ও স্বাধীনভাবে তদন্তের যোগ্য, এবং প্রয়োজনবোধে দোষী পুলিশ অফিসার এবং তাদের আদেশ দাতাদের বিচারের কাঁঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। আজ পর্যন্ত তেমন কোনও ধরণের তদন্ত ও শাস্তি প্রদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। শুধুমাত্র বাংলাদেশের একটি প্রাইভেট সংবাদ সংস্থা, এনটিভির সংবাদকর্মী আফজাল হোসেন, যিনি ৩১ শে মার্চ, ২০১৬ সালে স্থানীয় নির্বাচনের সংবাদ সংগ্রহকালে পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, তার ক্ষেত্রে পুলিশ তাদেরঅন্যায়ভাবে গুলিকরার ঘটনা স্বীকার করে এবং একজন পুলিশ সদস্যকে বরখাস্থ করেন, যদিও তারা জোর গলায় দাবি করেছেন যে গুলি চালানোর ঘটনাটি অসাবধানতাবশত ঘটেছে।

অধিকাংশ আহত ব্যাক্তিরা সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে তারা স্থায়ীভাবে জখমের শিকার হয়েছেন অথবা বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েছেন। পায়ে গুলিবিদ্ধ হওয়ার দরুন তাদের হাঁটুর হাড়, নরম টিস্যু, রক্তনালী, পেশী, এবং স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছু মানুষের অঙ্গচ্ছেদ করতে হয়েছে। অনেকেই বলেছেন যে গুরুতর জখমের যথাযথ চিকিৎসার পরিবর্তে তাদের জেলে পাঠানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২৪ বছর বয়সের জামাতের একজন সমর্থক বলেছেন যে নিরাপত্তা বাহিনী তাকে গুলি করে মার্চ, ২০১৩ সালে এবং তারপর তাকে সরকারী অর্থোপেডিক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় যেখানে তাকে ভাংচুর ও অবৈধ বিস্ফোরক ব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। তিনি আরও বলেন যে হাসপাতাল কর্মীরা তার চিকিৎসা করতে আগ্রহী ছিলনা এবং কর্মরত ডাক্তারা ছিলেন অবন্ধুসুলভঃ "তারা আমার রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। আমার প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে।"

এক ২২ বছরের যুবক বলেছেন যে, ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পরে তাকে আট মাস জেলে কাটাতে হয়। তার টিবিয়া ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং তিনি নড়াচড়া করতে

পারতেন না। তিনি চিকিৎসা কর্মীদের তত্বাবধানে ছিলেন কিন্তু তাকে অন্যান্য কয়েদীদেরকে টাকা দিতে হয়ছে তাকে সাহায্য করার জন্যঃ "আমি খুব অসহায় ছিলাম। ব্যথার জন্য উঠে বসতে পারতাম না। অন্য কয়েদীরা আমাকে খাইয়ে দিতো কিন্তু তাদেরকে আমার টাকা দিতে হতো।

একজন চিকিৎসক স্বীকার করেন যে তিনি কিছু আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করেছেন যাদের পুলিশ তাদের শটগান দিয়ে পায়ে গুলি করেঃ

> পুলিশ এখন তাদের কার্যপদ্ধতি পরিবর্তন করেছে। যেমন, যদি তারা আমার হাত এইভাবে ভেঙে দেয়, তাহলে কেউ বুঝতে পারবে না যে এটা ঘটনাক্রমে নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে ঘটেছে. . . কিছু ক্ষেত্রে গুলি শরীর ছিদ্র করে বেরিয়ে যায়, তাই কোন প্রমাণ পাওয়া যায়না। আবার কিছু ক্ষেত্রে গুলি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আমরা তাকে বলি ক্ষুদ্রকণা। এ ক্ষুদ্রকণাগুলো শরীরের ভেতর রয়ে যায়। আমি অনেক রোগীকে এ ধরনের জখম নিয়ে আসতে দেখেছি। এ ক্ষুদ্রকণাগুলো ক্ষতিকর নয় যতক্ষণ না তারা শিরায় প্রবেশ করে। যদি সেটা ঘটে, তাহলে শরীরের এ অংশটি কেটে ফেলতে হয়।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক সংগঠিত নির্যাতনের ঘটনাগুলো অনেকদিন থেকে তুলে ধরে এসেছে। এর মধ্যে আছে নির্যাতন, জোরপূর্বক অপহরণ, নির্বিচারে গ্রেফতার, বেআইনীভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধ্বংস ইত্যাদি। আরও রয়েছে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড যা বাংলাদেশে "ক্রসফায়ার" হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত কারণ নিরাপত্তা বাহিনী মিথ্যাভাবে দাবী করে যে মানুষটি গোলাগুলি বিনিময়কালে মৃত্যুবরণ করেছে।

এ রিপোর্টে ধারণকৃত অধিকাংশ "পায়ে গুলি চালানো" অভিযোগের ব্যাখ্যায় নিরাপত্তা বাহিনী একই ধরনের অজুহাত দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সেলিম (ছদ্মনাম), ১৮, অভিযোগ করেন যে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ, মারধর ও নির্যাতন করা হয়েছিল এবং পরে নিরাপত্তা বাহিনী তাকে ধরে নিয়ে বাম পায়ে গুলি করে। তার পা কেটে ফেলতে হয়। তার বাবা বিশ্বাস করেন যে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের এক স্থানীয় সমর্থকের সাথে সেলিমের বিবাদ থাকায় তাকে এ শাস্তি পেতে হয়। অন্যদিকে, পুলিশ দাবী করে যে, সেলিম ছাত্র শিবিরের সৈনিক।

পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, তাকে গ্রেফতারের পর জিজ্ঞাসাবাদ করলে, সেলিম আম বাগানে জমা করে রাখা অস্ত্রের সন্ধান দিতে রাজী হয়। পুলিশ বলে যে সেলিমের সঙ্গীরা অস্ত্র সন্ধানের সময় হামলা করে, তাই তারা আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালাতে বাধ্য হয় এবং সেলিম পালিয়ে যাবার সময় গুলিবিদ্ধ হয়।

এখানে তুলে ধরা অধিকাংশ ঘটনাগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। পুলিশ হেফাজতে গুলিবর্ষণের ঘটনাগুলো উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ সালের সংঘর্ষের পর, যখন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আই সি টি), ১৯৭১ সালে পাকিস্তনের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের দায়ে সাঈদীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। সাজা ঘোষণার পর জামায়েতের সমর্থকেরা রাস্তায় নামে এবং তারা অনেক মানুষের মৃত্যু ও জখম ঘটায়। নিরাপত্তাবাহিনীর প্রতিক্রিয়া ছিল কঠোর, তাদের লক্ষ্য বিক্ষোভকারী কিংবা আশেপাশের সাধারণ মানুষ দুইই ছিল। পরবর্তিকালে সুপ্রিমকোর্ট মৃত্যুদণ্ডাদেশ স্থগিত করে এবং সাঈদীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
জানুয়ারি, ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে আবারও সহিংসতা শুরু হয়। প্রধান বিরোধীদল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়, এবং দাবী করে যে অতীতের মত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে। বিএনপি ও জামাতের সমর্থকেরা হরতাল ও অবরোধ সফল করার জন্য জনসাধারণের উপর পেট্রল বোমা ব্যবহার করে। এ সহিংসতায় কয়েকশ মানুষ মারা যায় এবং গুরুতর জখম হয়।

ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ প্রায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনে জয়লাভ করে, এবং শেখ হাসিনা ওয়াজেদ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চালিয়ে যান । কিন্তু বিএনপি, জামায়েত ও অন্যদের দ্বারা সহিংস প্রতিবাদ এবং নিরাপত্তাবাহিনীর প্রতিরোধ ও সরকার কর্তৃক দমনের ফলে যে সহিংসতা সৃষ্টি হয় তা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে জানুয়ারী, ২০১৫ সালে সাধারণ নির্বাচনের এক বছর বর্ষপূর্তিকালে, যা আবারও মৃত্যু ও জখমের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এর আগেও বিরোধীদলের কর্মীদের দ্বারা সংগঠিত ভয়াবহ ভয়াবহ হামলার ঘটনাগুলো তুলে ধরেছে, বিশেষভাবে গনপরিবহনে পেট্রল বোমার ব্যবহার যা সাধারণ যাত্রীদের মৃত্যু এবং গুরুতর জখমের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে, সরকার বিরোধী সদস্যদের গুড়িয়ে দেয় এবং তাদের কয়েকশকে সহিংস হামলায় সন্দেহভাজন হিসেবে চিহ্নিত করে। মানবাধিকার কর্মীদের মতে, বাংলাদেশ সরকার "পায়ে গুলি চালানোর" এ পন্থা অবলম্বন করেছে মানুষকে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করাকে বাঁধা দেয়ার জন্য, যার ফলশ্রুতিতে, প্রতিবাদকারী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে চরম সহিংস মনোভাব লক্ষ্য করা যায়।

নিরাপত্তা বাহিনীর মতে, প্রতিবাদকারীদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়েছে জনসাধারণ ও তাদের সম্পত্তির উপর হামলা প্রতিরোধে অথবা আত্মরক্ষার খাতিরে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা প্রায়ই প্রচণ্ড চাপের মুখে থাকে সহিংসতা ও বিক্ষোভ প্রতিরোধের জন্য। কিন্তু, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় থাকাও তাদের অন্যতম দায়িত্ব। বাংলাদেশ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তিতে চুক্তিবদ্ধ একটি রাষ্ট্র; নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি (আইসিসিপিআর) এবং নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে চুক্তি এর অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশকে সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে কোনো ব্যক্তিই নির্যাতনের শিকার না হয়, এবং মামলার নিষ্পত্তির জন্য, আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনাল দ্বারা একটি নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ শুনানির ব্যবস্থা করতে এবং অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেককেই নির্দোষ হিসেবে ধরে নিতে হবে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে, অবিলম্বে এবং যথাযথভাবে গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর তদন্ত পরিচালনা করা বাংলাদেশের জন্য বাধ্যতামূলক। প্রমাণসহকারে দোষী ব্যাক্তিদের অভিযুক্ত করা এবং যদি আদালত কর্তৃক তারা দোষী সাব্যস্ত হয়, তবে সে অনুপাতে জরিমানা করাও তার আওতায় পড়ে। সকল ক্ষতিগ্রস্তদের অধিকার আদায়ের সুযোগ থাকবে এবং তারা সুষ্ঠু ও ন্যায়বিচার লাভ করবে, দায়ী ব্যাক্তিরা বিচারের সম্মুখীন হবে এবং আহতদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা দ্বারা সংগঠিত সকল সামরিক শক্তি ও আগ্নেয়াস্ত্রের অপব্যহারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের অবিলম্বে এবং একটি স্বাধীন তদন্ত পরিচালনা সুনিশ্চিত করতে হবে সেইসাথে দায়ী ব্যাক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যদি এ বিষয়টি জেনে থাকেন তবে তাদের দায়ী করা উচিত অথবা তাদের জানা উচিত ছিল যে তাদের নেতৃত্বের অধীনে সামরিক শক্তি ও আগ্নেয়াস্ত্রের বেআইনী ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু তারা এ ঘটনাগুলোর উল্লেখ, প্রতিরোধ কিংবা দমনে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

বাংলাদেশ সরকারের নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রকাশ্যে নির্দেশ দেওয়া উচিত যে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের সামরিক শক্তি ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারকালে জাতিসংঘের মূলনীতি মেনে চলতে হবে। এ মূলনীতি অনুযায়ী, নিরাপত্তা বাহিনী "প্রাণঘাতী আগ্নেয়াস্ত্র শুধুমাত্র তখন ব্যবহার করতে পারে যখন জীবন বাঁচান অপরিহার্য হয়ে পড়ে।" এ মূলনীতি আরও বলে যে,

"মৃত্যু, গুরুতর আঘাত বা অন্যান্য পরিণতির ক্ষেত্রে, একটি বিস্তারিত রিপোর্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে অবিলম্বে প্রেরণ করতে হবে।" যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের ফলে অঙ্গপ্রতঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, পরবর্তিতে যা অস্থায়ী অথবা চিরস্থায়ী বিকলাঙ্গতায় পরিণত হয়েছে, কর্তৃপক্ষের সেসব আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার তদন্ত করা উচিত। এ তদন্তের ফলাফল জনগণের কাছে প্রকাশ করা উচিত এবং সেইসাথে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রস্তাবনা

বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে

- নিরাপত্তা বাহিনী কর্তৃক সংগঠিত জনসাধারণের উপর সকল "পায়ে গুলি চালানোর" এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যান্য গুরুতর শারীরিকআঘাতের অভিযুক্ত ঘটনাগুলোর সত্যতা যাচাইয়ে জাতীয় কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্ত পরিচালনা করতে হবে, যা আহতদের রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর নির্ভরশীল নয়।
- নিরাপত্তা বাহিনীর নিজস্ব তদন্ত থেকে পৃথক--ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সকল সদস্য যাদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে--তাদের সকলের তদন্ত ও বিচারকার্য আদালতে সুনিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও সকল ধরনের লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত সদস্যদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- সামরিক শক্তির অপব্যবহারের সাথে জড়িত নিরাপত্তা বাহিনীর সকল সদস্য বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা মিশন যোগদানে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে।
- নির্বিচারে গ্রেফতার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদ্যসদের একটি বৃহৎ সংখ্যাকে একসাথে বন্দী করা প্রতিহত করতে হবে।
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর হেফাজতে নেয়া সকল ব্যক্তির আত্মীয় এবং আইনজীবীর সাথে অবিলম্বে যোগাযোগ করা সুনিশ্চিত করতে হবে এবং বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সকল বন্দীদের আদালতে হাজির করতে হবে।
- সকল নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে প্রকাশ্য ও স্পষ্ট নির্দেশনা জারি করতে হবে যে আইন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের সামরিক সামরিক শক্তি ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে জাতিসংঘের মূলনীতি মেনে চলতে হবে এবং সামরিক শক্তিব্যবহারের নিয়মনীতি ও জাতিসংঘের মূলনীতি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
- সকল নিরাপত্তা বাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত যাতে তারা জনগনের শান্তিপূর্ণ সমাবেশ ও মত প্রকাশের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে।

- প্রতিবাদ, হরতাল ও অন্যান্য সমাবেশে নিযুক্ত সকল নিরাপত্তা বাহিনীকে অপ্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করতে দেয়া উচিত যাতে ক্ষতির পরিমাণ সর্বনিম্ন থাকে। বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র যেমন রাবার বুলেট ও পেলেটের ব্যবহার সীমিত করতে হবে। সামরিক শক্তি ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের মুলনীতি অনুযায়ী, সকল মৃত্যু, গুরুতর আঘাত বা অন্যান্য পরিণতির ক্ষেত্রে, একটি বিস্তারিত রিপোর্ট অবিলম্বে জাতীয় মানবাধিকার সংস্থা এবং একটি স্বাধীন বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করতে হবে।
- বিক্ষোভ সমাবেশ অথবা হেফাজতে থাকাকালে, নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা আহত সকলে যাতে উপযুক্ত চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

জাতিসংঘ, দাতাগোষ্ঠী এবং অংশগ্রহণকারী সরকার যেমন ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের উদ্দেশ্যে

- তদন্ত পরিচালনাএবং উপযুক্ত সুপারিশ প্রদান করার জন্য, জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থার হাইকমিশনার, নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত এবং নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি সম্পর্কিত বিশেষ দূতকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণজানানো উচিত; যাতে বিচার ব্যবস্থা, জবাবদিহিতা ও নিরাপত্তা বাহিনীর পুনর্গঠন সুনিশ্চিত করা সম্ভবপর হয় এবং নিরাপত্তা বাহিনী স্বাধীন এবং পেশাগতভাবে কাজ করতে পারে।
- নির্বিচারে আটকের উপর জাতিসংঘের কর্মরত বিভাগকে, বিক্ষোভের সময় গ্রেপ্তার ও আটকে রাখার তদন্ত করার জন্য অবিলম্বে বাংলাদেশ সফরের জন্য অনুরোধ করা উচিত।
- নির্যাতন ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের জাতিসংঘের বিশেষ দূতকে "পায়ে গুলি" ও অন্যান্য নির্যাতনের তদন্ত পরিচালনা করতে বাংলাদেশ সফরের জন্য অনুরোধ করা উচিত।
- বাংলাদেশে একের পর এক সরকারের আমলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের মাত্রা ও সময়কাল মাত্রা ও সময়কাল চরমে পৌঁছানোর দরুন, মানবাধিকার পরিষদের আবেদন করা উচিত যে তাদের বিবেচনার জন্য জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থা একটি যৌথ প্রতিবেদন প্রকাশ করবে এবং যদি কোনো কারনে সরকার এ রিপোর্ট

অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণে অসফল হয় তবে বাংলাদেশের জন্য একটি বিশেষ সভা গঠনের উদ্যোগ নেবে।

- বাংলাদেশী মিডিয়া ও সামাজিক সংগঠন যারা সরকারের হুমকি ও চাপের মুখে স্বাধীনভাবে কাজ করতে অক্ষম, তাদের বিরুদ্ধে সরকারের হুমকি, ভীতি প্রদর্শন, এবং মিথ্যা মামলা দায়ের করা বন্ধ করতে হবে। দাতাগোষ্ঠীদের সামাজিক সংগঠনগুলোতে বিদেশী অর্থায়নের মাত্রা বৃদ্ধির জন্য সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে।